ভারত এক খেল্ - রাষ্ট্র ভুবন কবির খান বনাম পান সিং তোমার

শান্তনু চক্রবর্তী

প্রস্তাবনা

খবরে প্রকাশ, শচীন তেন্ডুলকরের হেলমেটে ভারতের জাতীয় পতাকার তিন রং একদম জ্বলজ্বল করে সাঁটানো মানে এনগ্রেভ করা আছে। যদ্দূর জানা যায়, এই তেরঙ্গা ব্যক্তি শচীনের মগজে একটা নিরন্তর জাতীয়তাবাদী চাপ রাখে। তাঁক কোনও সময়ই ভুলতে দেয় না—দেশ বা দল আগে, ব্যক্তিগত রেকর্ড পরে (অবশ্য ৯৯ থেকে ১০০ তম শতরানের মাঝখানের লম্বা সময়টায় যখন শচীনের ব্যাটে প্রায় রান ছিল না, ভারতও ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ায় দু-দুটো টেস্ট-সিরিজে 'হোয়াইটওয়াশ' হয়ে দেশে ফিরেছে: এমনকী এশিয়া কাপের যে ম্যাচটায় 'ঐতিহাসিক' সেঞ্চুরিটা এল, সে ম্যাচেও খানিকটা শচীনের স্লো-ব্যাটিংয়ের জন্যই যখন ভারতকে হারতে হয়, তখন 'জাতীয়তাবাদী' শচীন আর ব্যক্তিগত রেকর্ডনির্মাণকারী শচীনের ভেতর কতটা কী টানাপোড়েন চলেছিল, সেটা এখানে বিবেচ্য নয়)। লাতিন আমেরিকার প্রধান দুই ফুটবল-খেলুড়ে দেশ ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার জার্সি তাদের জাতীয় পতাকার রঙে। আটের দশকে ভারতীয় ফুটবল দলের যুগোশ্লাভ কোচ (তখনও ইউরোপের মানচিত্রে যুগোশ্লাভিযা বলে একটি আস্ত দেশের অস্তিত্ব ছিল) চিরিচ মিলোভান, জাতীয় দলের জার্সির চিরকালীন ডিজাইন পালটে, জার্সি-শর্টস-সক্স বা মোজা সহ পুরো সেটটাই দেশে পতাকার ত্রিবর্ণ রঙে রঞ্জিত করে দেন। প্রবীণ ফুটবল বিশেষজ্ঞের হয়তো মনে হয়েছিল, ফুটবল - শক্তিতে নেহাতই এলেবেলে (ভারতীয় ফুটবলের 'সোনার টিম' -ও হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে যুগোস্লোভিয়ার কাছে ১০-১ গোলে হেরেছিল) এই তৃতীয় বিশ্বের দেশটা জাতীয় পতাকার ছোঁয়ায় অন্তত দেশপ্রেমের শক্তিতে মাঠে জেগে উঠবে।

বৃদ্ধ মিলোভানের স্বপ্ন সফল হোক বা না হোক, খেলার ময়দানে জাতীয়তাবাদের তীব্র উদ্দীপক ভূমিকার কথা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। ১৯৮৬-র বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে, ইংরেজ গোলরক্ষক পিটার শিলটনের মাথা টপকে মারাদোনার 'হ্যান্ড অফ দ্য গড' গোলটাকে গোটা আর্জেন্টিনার মানুষ ফকল্যান্ড যুদ্ধের বদলা বলেই ধরে নিয়েছিল। এমনকী ওই ম্যাচেই পরপর ছ' জনকে ড্রিবল করে মারাদোনার দ্বিতীয় গোলটা, ফিফা যেটাকে শতাব্দীর সেরা গোলের শিরোপা দিয়েছে, আর্জেন্টিনাবাসী সেই ম্যাজিক গোলটার চেয়েও রেফারির চোখের ফাঁকি দেওয়া ওই 'ফাউল গোল'টা নিয়েই বেশি গর্বিত থেকেছে। কারণ তাদের মনে হয়েছিল এই 'অবৈধ' গোলটার মাধ্যমেই দিয়াগো, গোটা আর্জেন্টিনার হয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাগি থ্যাচারের 'বিশ্বাসঘাতকতা' আর 'দাদাগিরি'-র মুখের মতো জবাব দিয়েছে। এমনি করেই নানান ছলে খেলার আসরে ঢুকে পড়ে রাষ্ট্র। ঢুকে পড়ে তার যাবতীয় স্বার্থ, ধান্দা, মতলব, দায়িত্ব, কর্তব্য, দাপট, দাদাগিরি ও অভিভাবকত্ব নিয়ে।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বা পূর্ব ইউরোপ থেকে যে ক্রীড়াবিদরা চার বছর অন্তর অলিম্পিকের আসরে আসতেন, তাদের দায়িত্ব ছিল যত বেশি সম্ভব মেডেল জিতে সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের মডেলের 'ধারাবাহিক সাফল্য'কে গোটা বিশ্বের নজরে আনা। রাষ্ট্র তাদের সমস্ত দায়িত্ব নিত। এমনকী রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায়, মদতে, রাষ্ট্রেরই সুরক্ষা বলয়ে, তাদের নাকি বৈজ্ঞানিক ডোপিং-এরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকত। অন্যদিকে ডোরা আর তারায় সাজানো আমেরিকান পতাকার রঙে কস্টিউম পরে যে অ্যাথলিট বা জিমন্যাস্টরা ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে বা জিমন্যাস্টিকস্ ফ্লোরে রুশদের মোকাবিলা করতেন তাদেরও তো কোথাও প্রতিটি অলিম্পিক পদকের গায়ে 'মুক্ত-উদার' গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উচ্ছ্বাস আর উজ্জ্বলতার রং লাগানোর পালটা গোপন - নিঃশব্দ অ্যাজেন্ডা থাকত। সেখানে রাষ্ট্র হয়তো সরাসরি আগ্রাসী টোটালিটারিয়ান চেহারা নিয়ে হাজির থাকে না। কিন্তু মতাদর্শগত কর্তৃত্বের একটা চাপ তো থাকেই। তাছাড়া কর্পোরেট স্পনসর, বিজ্ঞাপন সংস্থা, ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি, এরাই তো ধনতন্ত্রের মায়াবী আলোয় মাখামাখি 'দ্য গ্রেট আমেরিকান ড্রিম' -এর হাতছানি পাঠায়। মার্কিন জাতীয়তাবাদ আর এই আমেরিকান স্বপ্নের দূরত্বটা কিন্তু ওয়াশিংটন ডি.সি. থেকে আলাস্কার মতো দুস্তর নয়। কার্ল লিউইস বা মার্ক স্পিৎজ্‌রা, ট্র্যাকে বা পুলে এই দূরত্ব তুড়ি মেরেই পেরিয়ে যান।

এই কর্পোরেট-জাতীয়তাবাদ, স্পনসর্ড দেশপ্রেমের রমরমা ফলিত প্রয়োগ আমরা আরও পরিষ্কার করে দেখতে পাই এই উপমহাদেশের ক্রিকেট-চর্চায়। ক্রিকেট, বিশেষ করে বিশ্বকাপ সুদ্ধু নানা কিসিমের সীমিত ওভারের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, ভারতে বাণিজ্য আর দেশপ্রেমকে একটা সিঙ্গল ব্র্যাকেটের মধ্যে নিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর 'বুম্' বা বিস্ফোরক সাফল্য ও ৯০-এর লিবারেলাইজেশন -উত্তর ভারতীয় অর্থনীতির গ্লোবাল-ঝাঁপ ক্রিকেটকে একটা হাই-সেলেব্‌ল বা বিদ্যুৎগতিতে বিকিয়ে যাওয়া একটি 'পণ্য' বা কনজিউমার প্রোডাক্টের চেহারা দিয়েছে। আর ভারতজোড়া খোলা গ্লোবাল হাটে সেই পণ্যর বিকিকিনি আরও অনায়াস হয়েছে। ভারত-জোড়া এই বাজারের পাশাপাশিই ক্রিকেট-উন্মাদনার এই উপমহাদেশীয় নির্মাণে কোথাও 'ভারত-জোড়া জোড়া গোছের জাতীয় সংহতির শ্লোগান স্পষ্ট থাকে। 'হমারা বাজার'-এর টিভি কমার্শিয়ালের মতোই এও যেন 'বুলন্দ ভারত কী বুলন্দ তস্‌বির' রচনার একটা প্রক্রিয়া—যেখানে গ্রামের চাষি থেকে শহরের মধ্যবিত্ত চাকুরে, সমুদ্রপারের মাছধরা জেলে থেকে তথ্যপ্রযুক্তির উদ্যোগপতি, হিন্দু-মুসলিম, দলিত-ক্ষত্রিয়,

উন্নয়ন-অনুন্নয়ন, সবু-বিপ্লবের হরিয়ানা - পাঞ্জাব ও কৃষক আত্মহত্যাপ্রবণ বিদর্ভ-অন্ধ্র, বড়ো বড়ো শিল্পতালুকওয়ালা গুজরাট-মহারাষ্ট্র ও শিল্পাল্পতায় বিহার-ঝাড়খণ্ড, সব একাকার!

ক্রিকেট নামের পণ্যটিকে ঘিরেই এই যে গণ-হিস্টিরিয়া, আসমুদ্রহিমাচাল আবেগ-থরধর, বুকে - পিঠে-মুখে চুলে ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয়তাবাদ, আমাদের 'জাতীয় কালচার'-এ এর সঙ্গে তুলনা করার মতো একটাই ঘটনা বা একটাই 'প্রোডাক্ট' আছে, সেটা হল বলিউডের সিনেমা। ক্রিকেটের মতোই এই উপমহাদেশের সমস্ত নারী-পুরুষ এমনকী ইউরোপ আমেরিকার উপমহাদেশীয় 'ডায়াস্পোরা' -ও বলিউডের 'কনজিউমার'। ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের মুহূর্তে যেমন কলকাতার ঝুপড়ি আর সাতমহলা মুম্বাইয়ের প্রাসাদ, ট্র্যাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা বিদেশি গাড়ির মালিক আর ঝাড়ন হাতে গাড়ি মুছতে ছুটে আসা পথশিশুর উত্তেজনা আর উল্লাসকে মিলিয়ে দিতে পারে, তেমনি প্রত্যেকটা হিন্দি ছবির হৃদয়ের অন্দরেও ছায়া ছায়া আছে এ কল্পিত 'নেশন'-এর মানসভূমি! এই 'নেশন'-এর ধারণাকে ঘিরেই হিন্দি ছবির যাবতীয় নৈতিকতার দোলাচল, নাটক চলে। কে ভালো, কে অতি বদ, কে হিরো, কে ভিলেন, সেটা ঠিক হয়ে যায় কে সাচ্চা দেশভক্ত আর কে নয়, তাই দিয়েই! ক্রিকেট যেভাবে একটা 'হোমোজিনিয়াস' দর্শক তৈরি করে, যাদের কেউ স্টেডিয়ামের বাতানুকুল বক্সে বসে, আর কেউ ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের শোরুমের বাইরে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে খেলাটা দেখে এবং এক ভারতীয় টিমের জন্য গলা ফাটায়—বলিউডের সিনেমাও সেভাবেই একটা 'হোমোজিনিয়াস' রাষ্ট্র তথা 'নেশন' নির্মাণের মিশনে নেমে পড়ে। সেখানে গরিব-বড়োলোকের অনেক দুস্তর শ্রেণি-বৈষম্য ঘুচে যায়। অনেক অসম্ভব, আকাশকুসুম রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক প্রকল্পও ততটা অবাস্তব মনে হয় না। রাষ্ট্রের অনেক পাপ-প্রত্যাশা, রাষ্ট্রের দেওয়া অনেক আঘাত-বঞ্চনাকেও আর ততটা দুঃসহ মনে হয় না। সিনেমা-ঘরের অন্ধকারে বসে নেশন রাষ্ট্রকে পরিত্রাতা, সংবেদনশীল বন্ধু, সুখ-দুঃখের সাথি বলে মনে হয়।

অবশ্য ক্রিকেট মাঠে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যেমন পাকিস্তানের সঙ্গে ম্যাচে সবচেয়ে উদ্বেল, স্পর্শকাতর, আগ্রাসী, মিলিট্যান্ট চেহারায় হাজির থাকে, বলিউডের পপ-দেশপ্রেমও তেমনি পাকিস্তানকে তুলোধোনার একটা সুযোগও নষ্ট করে না। কার্গিল যুদ্ধের আগে-পরে অন্তত তিনটে বলিউডি ছবি 'বর্ডার', 'গদর', বা 'পুকার'-এ বেশ চড়া পাকিস্তান-বিরোধী জিগির দেখা গেছে। 'বর্ডার'-এ ট্যাঙ্ক-সাঁজোয়া গাড়ি সজ্জিত পাকিস্তানি হানাদার-বাহিনীর মুখোমুখি রাজস্থান সীমান্তের ছোটো এই সেনা চৌকির প্রায় ঢাল তরোয়ালহীন এক মুঠো ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর দীর্ঘ (তিন ঘন্টার ছবি প্রায় ঘন্টাখানেক) মরণপণ যুদ্ধের অনুসঙ্গে অনেক দর্শকের মনেই দিল্লি, করাচি বা শারজায় ভারত বনাম পাকিস্তানের একদিনের ক্রিকেট ম্যাচের অনেক উত্তেজক স্মৃতি উঠে আসতেই পারে। এবং এটা ঘটনা যে 'বর্ডার' দেখে বেরিয়ে লন্ডন, লিড্স-সহ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে ভারতীয় ও পাকিস্তানি দর্শকদের মধ্যে দাঙ্গা বেধে গিয়েছিল। উপমহাদেশের বাইরে দু-দেশের ক্রিকেট ম্যাচ নিয়ে যেমন নয়! কিন্তু এটা তো পাক-বিরোধী যুদ্ধ-জিগিরকে সিনেমায় স্ট্রাকচারাল চালাকিতে দু-তরফের ক্রিকেট যুদ্ধের অনুষঙ্গে নিয়ে আসার চেষ্টা। আজ বলিউড যদি তার জাতীয়তাবাদী প্রকল্পেই, তার 'নেশন' নির্মাণের প্রক্রিয়ায় সরাসরি ক্রিকেটকে নিয়ে আসে, তাহলে যে ঘটনাটা ঘটে, বলিউড সিনেমার ইতিহাসে তারই নাম 'লগান'!

২০০১ সালের ছবি 'লগান' -কে অনেকেই নতুন মিলেনিয়ামের পুরাণ-কথা বলে থাকেন। 'বর্ডার'-এর শেষ একঘন্টার রক্তাক্ত সীমান্ত-যুদ্ধের ট্রিটমেন্টে কোথাও যদি ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট মহারণের স্লগ-ওভারের টানটান টেনশন থাকে, তাহলে 'লগান' -এর শেষ ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট জুড়ে যে আস্ত একটা ক্রিকেট ম্যাচ চলে, তারও শোক-হর্ষ-উল্লাস-বিষাদ-সংকল্প-পুরুষকার, সাময়িক বিপর্যয় বা অন্তিম বিজয়ের বিভিন্ন পর্বে, মহাভারতের মতো কোনও মহাকাব্যিক যুদ্ধের খণ্ডিত আভাস থাকতেই পারে। কিন্তু এই তথাকথিত মহাকাব্যিক মিলেনিয়াম পুরাণগাথার আড়ালেও বলিউডের নেশন-নির্মাণের মিশনটা সবসময় জারি থাকে। ২০০১ সালে দাঁড়িয়ে ১১০ বছর আগেকার ঔপনিবেশিক ভারতের এক টুকরো কল্প-ইতিহাস আঁকতে গিয়েও 'লগান' নির্মাতারা কিন্তু নেশন-ভারতকেই খুঁজে দেন। খাজনা-মকুবের মতো একটা স্থানীয় বা 'লোকাল' ইস্যুও শেষ অবধি লড়াই ও আবেগের অভিঘাতে একটা 'জাতীয়' ঘটনা হয়ে উঠেছে। আবার স্থানীয় ব্রিটিশ প্রভুর ঔপনিবেশিক দম্ভ বা ঔদ্ধত্যের মোকাবিলায় আওধ অঞ্চলের কল্পিত চম্পাণের গ্রামের কৃষিজীবী জনতা সংহতির যে 'মডেল'টা তুলে ধরে, তার সঙ্গে 'নেশন ভারত' নির্মাণের ঘোষিত আদর্শগুলো মিলে যায়। স্বাধীন ভারতে পণ্ডিত নেহরু, তথাকথিত বৈচিত্র্যের মধ্যে' যে সমসত্ত্ব শক্তিশালী 'ঐক্যবদ্ধ' ভারত-রাষ্ট্রের রূপ দেখেছিলেন, 'লগান'-এর প্রোটাগনিস্ট ভুবনের নেশন-ভাবনাও তার চেয়ে বিশেষ দূরে নয়।

আসলে 'লগন' -এর পরিচালক আশুতোষ গোয়ারিকরও ১৮৯৩ সালের ভুবনকে ২০০১ -এর ভারতীয় রাষ্ট্র-সংবিধান সংহতির ভাবনার কেন্দ্রেই দেখতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসক ক্যাপ্টেন রাসেলের সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরাচারকে 'প্রতিরোধ' করার প্রেরণা বা জোরটা তাই আধুনিক ভারতরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংহতির প্রক্রিয়া থেকেই পাচ্ছে ভুবন। ১৮৯৩ সালে স্বাধীন ভারতের তেরঙ্গা নিশানের ডিজাইন চম্পাণের গ্রামের ধারে কাছে না থাকলেও, পাঁচমিশেলি পোশাক পরা 'ভুবন্স ইলেভেন' বা ভুবন একাদশের গ্রুপ ফোটোর ফট বা ব্যাকগ্রাউন্ডটা তাই গেরুয়া-সাদা-সবুজ রাঙিয়ে দিলেও দিব্যি মানানসই হত। ভারতীয় ক্রিকেট দলের অফিসিয়াল স্পনসর সাহারা ইন্ডিয়া লিমিটেডও ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। তাই সেইসময় সাহারার একাধিক বিজ্ঞাপনেই টিম ইন্ডিয়াকে ভুবন

একাদশের বিখ্যাত কস্টিউমে দেখা গেছে (অবশ্যই কম্পিউটারে মফিং -এর কারিকুরিতে) এবং সেই ছবির পটভূমিতে অবশ্যই পতপতিয়ে উড়েছে সাহারার তেরঙ্গা লোগো। এমনি করেই ভারতীয় ক্রিকেটে শচীনের মতোই ভুবনও 'লগান্' -এর এক কল্পিত নেশনের জাতীয় আইকন হয়ে ওঠে। তার কাঁধেও থাকে নেশনের অঘোষিত 'মিশন' -বৈচিত্র্যের নানা রম, বিরোধিতার নানা স্বরকে আত্মস্থ করে ভারত নির্মাণের 'রাষ্ট্রীয়' কর্মসূচীর পথে সে-ও হেঁটে যায়।

অবশ্য ক্রিকেট বাদ দিয়ে খেলার মাঠে জাতীয়তাবাদের 'প্র্যাকটিশ' -এর সুযোগ ভারতবাসী বিশেষ পান না। বলিউডের সিনেমায় পপ-দেশপ্রেম যদিও ঘুরে ফিরেই নানাভাবে উঠে আসে; তবে ক্রিকেট ও দেশের ডাক এক সঙ্গে মিলেমিশে গেলে কী হতে পারে 'লগান' ছাড়া তেমন কোনও 'টেক্সট' আমাদের হাতে নেই। জাঁ-র বা জেনর-এর হিসেবে যাকে বলা যায় 'স্পোর্টস মুভি', বলিউডেও তেমন ছবি প্রায় তৈরিই হয় না। তাই খেলার মাঠে নৈতিক মতাদর্শের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অ্যাজেন্ডা নিয়ে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ এবং সিনেমার পর্দায় সেই রাষ্ট্রনৈতিক কর্মসূচির টানাপোড়েন বলিউডে প্রায় ঘটেই না। বছর কয়েক আগে 'গোল' নামে একটি ছবি হয়েছিল, যেখানে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে অনাবাসী ভারতীয়দের পরিচালিত একটি ক্লাবের অস্তিত্বের সংকটের গল্প বলা হয়েছিল। শেষ অবধি কীভাবে উপমহাদেশীয় ডায়াস্পোরার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, শ্বেতাঙ্গ চক্রান্ত ব্যর্থ করে নিজেদের 'গোল' বা লক্ষ্যে 'কামিয়াব' হয়; তাই নিয়েই গোটা ছবিটা। কিন্তু এটার সঙ্গে হাবিজাবি আরও অনেক কিছু ঢুকে গিয়ে ছবির মূল ফোকাসটা প্রায়ই ঠিক থাকেনি। তাছাড়া ভারতীয় ভৌগোলিক সীমানার বাইরে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের একটা ভিন্নতর প্রেক্ষিতে, 'গোল' ভারতীয় 'আইডেনটিটি'-র সমস্যা নিয়ে সেভাবে মাথাও ঘামায়নি। বরং শ্বেতাঙ্গ কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে টক্কর নেওয়ার জন্য এখানে দক্ষিণ-এশীয় সলিডারিটির ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। তাই এমনকী করণ জোহরের 'কভি খুশী কভি গম' ছবিতে কাজল তার লন্ডন পরবাসেও যেভাবে ঠাকুরঘর, রোজ সকালের পুজো-পাঠ, মন্ত্র, পুরোনো হিন্দি ফিলমি গান ও 'জনগণন অধিনায়ক'-এর 'স্বাদেশিকতা' সুদ্ধু এক টুকরো চাঁদনি চক্-এর নস্টালজিয়া বাঁচিয়ে রাখেন, গোল-এ সেরকমও কোনও 'দেশপ্রেমিক' স্মৃতিকাতরতা নেই। তাই খেলার মাঠের সূত্রে সিনেমার পর্দায় 'নেশন' নির্মাণের প্রকল্পে এই ছবিটা আসে না।

বরং এখানে আমরা শাহরুখ খান অভিনীত যশরাজ ফিল্মসের 'চক দে ইন্ডিয়া'-র কথা ভাবতে পারি। ২০০৭ -এর এই ছবিটার কেন্দ্রে আছে, ভারতের একদা জাতীয় খেলা, অধুনা লুপ্তপ্রায় হকি। ছবিটা বক্স - অফিসে সাফল্য পাওয়ার পর কিছুদিন এদেশে হকির কপাল ফিরেছিল। দিল্লিতে এশিয়া কাপ হকি আর নেহরু কাপ ফুটবল দেখতে এসে দর্শকেরা 'চক দে ইন্ডিয়া' বলে শ্লোগান-ও তুলেছিল। ভারতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্পেস্-এ ক্রিকেটের একচেটিয়া আধিপত্য; তার রঙিন বাণিজ্যিক প্যাকেজিং নিয়ে ছবিটার সরাসরি আক্রমণাত্মক মন্তব্যও থেকেছে। কিন্তু 'চক দে ইন্ডিয়া' শুধুই শূন্য থেকে শুরু করা ভারতীয় মহিলা হকি দলের বিশ্বকাপ জয়ের টানটান নাটকীয় রোমাঞ্চকর ইচ্ছাপূরণের আখ্যান নয়। এই ছবিটা আসলে কবির খান নামে এক প্রাক্তন ভারতীয় তারকা তথা বিশ্বকাপজয়ী মহিলা হকি দলের কোচের ব্যক্তিগত লড়াইয়েরও গল্প। 'চক দে ইন্ডিয়া' আধুনিক ভারতীয় 'নেশন' নির্মাণে কবির খান নামে এক সংখ্যালঘু মুশলিম ভারতীয় যুবকের অবদান ও অংশগ্রহণ নিয়ে একটি ডিসকোর্স-ও। 'লগন'-এর ভুবনের মতোই কবিরও কীভাবে ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতির জাতীয় 'আইকন' হয়ে ওঠে, 'চক দে ইন্ডিয়া'-র আলোচনা প্রসঙ্গে সেটা আমরা দেখব।

এখন ভুবন বা কবির খানের সঙ্গে ভারত রাষ্ট্রের ইকুয়েশনের জায়গাটা আপাতভাবে বেশ সরল। হিন্দি ছবির 'কল্পিত নেশন'-এ এদেরকে 'প্লেস' করতে কোনও সমস্যা হয় না। কিন্তু পান সিং তোমারের সঙ্গে ভারত রাষ্ট্রের সম্পর্কটা এমন, দুই আর দুই চারের মতো করে মিলিয়ে দেওয়া যায় না। এখানে আর একটা কথা বলা দরকার। 'ভুবন' বা 'কবির খান' এরা দুজনেই কাল্পনিক চরিত্র। ফলে খেলার মাঠে রাষ্ট্রের মরজিমাফিক দখলদারি প্রোজেক্টে এরা সহজেই আগুয়ান ভূমিকা নিতে পারে। আবাব বলিউড সিনেমায় কল্পিত 'নেশন' -এর ধারণাটাকেও এরা গোটা সিনেমা জুড়ে জ্যান্ত ও কার্যকরী রাখতে পারে। কিন্তু ২০১২-র মুক্তি পাওয়া টিগমাংশু ডুলিয়ার 'পান সিং তোমার' তো বায়োপিক বা জীবনী চিত্র। তার মানে 'পান সিং তোমার' নামে যে চরিত্রটিকে আমরা পর্দায় দেখি, তিনি সত্যি সত্যিই রক্তমাংসের জীবনে, স্বাধীন ভারতের 'নেশন' নির্মাণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বাধীনতার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রথম যুগের রিক্রুটা সার্ভিসেসের হয়ে সাতবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলিট। এশিয়ান গেমস বা আন্তর্জাতিক ডিফেন্স মিটে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। আবার এক্স-সার্ভিসম্যান বা অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী হিসেবে চম্বলের দুর্ধর্ষ দস্যু সর্দার বা 'বাগি' বিদ্রোহী! রাষ্ট্রের কাছে যার মাথার দাম অনেক হাজার টাকা। যে রাষ্ট্র 'স্পোর্টসম্যান' বলে সেনাবাহিনীর চালু নিয়ম মেনে তাঁকে যুদ্ধে অবধি পাঠাচ্ছে না সেই রাষ্ট্রই বেহড়ের দেওয়ালে দেওয়ালে তাঁর নামে 'ওয়ান্টেড' অপরাধীর নোটিশ টাঙিয়ে দিচ্ছে। ফলে এমনিতেই পান সিং-এর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কে আনুগত্য ও সংঘর্ষের একটা 'ডিকোটমি', একাট বিরোধিতা তৈরি হয়েই থাকে। তাই নেশন-নির্মাণের বৃত্তে কবির ও ভূবনের বিন্দু থেকে অন্য দিকেই থাকবে পান সিং-এর অবস্থান। আবার ভুবন যেভাবে তার সামাজিক-সাম্প্রদায়িক অবস্থান থেকে রাষ্ট্রের মূলধারার অংশ হতে পারে, কবির খান সেভাবে পারে না। ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে বাবরি মসজিদ উত্তর ভারতীয় নেশন নির্মাণের প্রক্রিয়ায় তার অংশগ্রহণ নিয়ে

কোথাও একটু দ্বিধা-অস্বস্তির 'ডায়ালেক্‌টিক' থেকে যায়। আলোচনার পরের পর্বে আমরা বলিউডের এই তিনটি স্পোর্টস ফিল্ম 'লগন', 'চক দে ইন্ডিয়া' ও 'পান সিং তোমার' -এর টেক্সটের প্রেক্ষিতে ভুবন, কবির ও পান সিং-এর সঙ্গে ভারত-রাষ্ট্রের সম্পর্কের টানাপোড়েনগুলো খুঁজব। নেশন-নির্মাণের প্রক্রিয়ায় তাদের সমঝোতা ও বিরোধের সূত্রগুলে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা দেখব 'খেলা'র ছলে বলিউড কতটা রাষ্ট্রের মন-পসন্দ 'নেশন' ভারতের চেহারা তুলে ধরতে পারছে— আবার কোথায় ঢেকে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও বিরোধের ফাঁকগুলো বেরিয়েই পড়ছে!

লগান: ক্যাপ্টেন গান্ধি ও ভুবনের ছক্কা

'লগান'-এ ক্যাপ্টেন রাসেল ও তার ফৌজি দলবলের সঙ্গে চম্পাণবাসীর ক্রিকেট -ম্যাচটার বাজি বা বেটিংটি কী ছিল, আমরা সেটা সব্বাই জানি। আমরা জানি, ভুবনরা যদি ম্যাচ হারত তাহলে ওদের দিতে হত তিন গুণ খাজনা বা 'লগান'। আর ম্যাচ জিতে চম্পাণের সহ গোটা অঞ্চলের কৃষক-জনতার 'ট্রফি' হল তিন বছর খাজনা মকুব। আমরা জানি, উনিশ শতকের শেষ দশকে কয়েক বছরের অনাবৃষ্টিতে শুকনো খটখটে ওই আওধা অঞ্চলে ফলন ভালো হচ্ছিল না। কৃষকেরা ফসলের দাম পাচ্ছিল না। তাই খাজনা মাফের আরজি নিয়েই তারা স্থানীয় ব্রিটিশ শাসনের কাছে দরবার করতে এসেছিল। ওই অঞ্চলের যিনি দেশীয় রাজা, প্রজদের হয়ে তিনিও ব্রিটিশ শাসকদের কাছে সুপারিশ নিয়ে এসেছিলেন। ক্যাপ্টেন রাসেল রাজাসাহেবকে শর্ত দিয়েছিলেন, তিনি যদি ব্রিটিশ সেনা অফিসারদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে মাংস খেতে পারেন, তাহলে তার প্রজাদের খাজনা মকুব হয়ে যাবে। রাজা লজ্জায়-ঘেন্নায় অপমানে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন! কারণ মাংস খেলে তিনি ধর্মভ্রষ্ট হবেন। প্রজাদের তাৎক্ষণিক স্বার্থের চেয়েও হাজার হাজার বছরের পুরোনো সনাতন ধর্মের ঐতিহ্য ও মর্যাদা রক্ষা তার কাছে অনেক বেশি জরুরি। প্রজাদের ছেড়ে তিনি তাই ধর্ম বাঁচালেন। ভুবনদের সামনেও তাই ক্রিকেট ম্যাচের চ্যালেঞ্জ নেওয়া ছাড়া আর কোনও বিকল্প থাকল না।

এই যে রাজামশাই প্রজাদের বৈষয়িক স্বার্থের চেয়েও ধর্মরক্ষাকেই বেশি গুরুত্ব দিলেন, এজন্যে কিন্তু প্রজাদের তরফেও ক্ষোভ, অভিমান, অসন্তোষ, দীর্ঘশ্বাস কিছু দেখা গেল না। বরং রাজামশাইয়ের এই ভূমিকাকে তারা ম্লেচ্ছ, সংস্কারহীন পশ্চিমি সংস্কৃতির আধিপত্য - আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রাচ্য-জাতীয় চেতনার প্রতিরোধ হিসেবেই ধরে নেয়। ছবিতেও গোটা দৃশ্যটা যেভাবে এসেছে, তাতেও ব্যাপারটাকে মাংস-বিলাসী পশ্চিমি-বিলিতি সভ্যতার উগ্র-ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে শান্তসংহত অহিংস-শান্তিপ্রিয় ভারতীয় ঐতিহ্যের তরফে নীরব, সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ বলেই মনে হবে। শাকাহারী দেশীয় রাজা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে এতটুকু বিরক্ত বা বিরোধিতা না করার শর্তে তাঁর রাজ্যপাট ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রহরাতেই সুরক্ষিত থাকে; তিনিই তাঁর প্রজা-সাধারণের চোখে ভারতীয় 'প্রাইড' বা জাতীয় গরিমা রক্ষার 'নায়ক' হয়ে ওঠেন। আর এখান থেকেই কিন্তু 'লগান' -এর নেশন-নির্মাণের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডাটা পরিষ্কার হয়ে যায়। আমরা বুঝতে পারি, 'লগান' যে ভারতীয়ত্বর ছবি তুলে ধরছে তার নিজস্ব কিছু লক্ষণ বা পরিচয় আছে। যেন 'ভেজিটেরিয়ানিজম' বা যাবতীয় আমিষ খাদ্যের ছোঁয়াবর্জিত নিরামিশ আহার। যেমন, ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মাচরণের চিহ্নগুলোর রাষ্ট্র ও রাজনীতিক নৈতিক বা এথিক্যাল কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা। যেমন, রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক নীতি ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে সনাতন সমাজের সংস্কার, ঐতিহ্য, অভ্যেসের ফারাক ঘুচিয়ে ফেলা। সব মিলিয়ে এই 'নেশন' ভারত এক 'ছদ্ম' ও 'কল্প' নৈতিকতার ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সেই ভারতে বৈচিত্র্য যদি-বা থাকে, বৈষম্য, বিরোধ বা বিচ্ছিন্নতার কোনও জায়গা নেই। সেই ভারত চম্পাণের গ্রামের মতোই একটি সমসত্ত্ব ইউনিট। তার প্রতিটি উঠোন নিকোনো— আকাশে বৃষ্টি, ক্ষেতে ফসল না-থাকলেও সে গ্রামের জীবনযাত্রায় দারিদ্র্য-মালিন্যের কোনও ছাপ নেই! সেখানে সুখ আছে, (হিন্দু) পরবের উৎসব আছে, ফেজ টুপি পরা নমাজি মুসলিমরা আছে, হিন্দু-মুসলিমের মিলমিশ-ভাইবেরাদরি আছে। এবং সেই গ্রামে শ্রেণি-সম্পর্কের কোনও আবছা, অস্পষ্ট চেহারাও বোঝা যায় না— অথচ মোড়ল, কৃষক, কামার, কুমোর, জ্যোতিষী, পুরোহিত, বৈদ্য সুদ্ধু একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির আভাস আছে। এই স্বনির্ভর গ্রামই তো 'হিন্দ্ স্বরাজ' -এর প্রাথমিক ইউনিট! তার মানে চম্পাণের গ্রামের রাজনৈতিক নিশ্বাস-প্রশ্বাসে যিনি শেষ অবধি থেকে যাচ্ছেন, তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। ঐতিহাসিক সময়ের বিবেচনায় যদি ১৮৯৩ সালের এপ্রিলে সদ্য বিলেতফেরত তরুণ ব্যারিস্টার মিস্টার গান্ধি, তাঁর প্রথম বড়ো অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে সবে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাচ্ছেন— যদিও 'মেকিং অফ মহাত্মা'- 'মেকিং' দূরে থাক, সলতে পাকানোর পর্বটুকুও তখন শুরু হয়নি—গান্ধিজি তখনও নেহাতই এক গুজরাটি-বানিয়া সুযোগসন্ধানী কেরিয়ারিস্ট—তবুও 'লগান'-এ যে রাষ্ট্র-নির্মাণের প্রক্রিয়া চলে, সেটা আসলে গান্ধিজিরই স্বপ্নের 'নেশন ভারত'। তাই শেষ বলে ছক্কা মেরে মরণবাঁচন ম্যাচ জেতালেও চম্পাণের একাদশের আসল ক্যাপ্টেন ভুবন নয়— মোহনদাস গান্ধি! তিনিই ভুবন একাদশের কোচ-মেন্টার-সর্বাধিনায়ক। চম্পাণে তাঁর কল্প-নেশন, তাঁর রাম রাজ্য— যেখানে রাজধর্ম, ঈশ্বর-নৈতিকতা, কৃষক ও রাজন্যবর্গ, দলিত ও বর্ণহিন্দু সব একাকার।

আমরা আগেই বলেছি ঐতিহাসিক কারণেই গান্ধিজির পক্ষে ১৮৯৩-এর চম্পাণে থাকা সম্ভব নয়। তেমনি

একইভাবে ভুবনের পক্ষেও গান্ধিবাবার চেলা হওয়া সম্ভব নয়। কল্পিত চম্পাণের থেকে দু-আড়াইশো কিলোমিটার পুবে গেলেই বিহারের যে চম্পারণ (নামের মিলটাও লক্ষণীয়), সেখানে সত্যাগ্রহের ভারতীয় চ্যাপ্টার শুরু করতে গান্ধির তখন প্রায় আড়াই দশক দেরি আছে। কিন্তু তবু 'লগান' জুড়ে ভুবন গান্ধিজিরই 'স্বেচ্ছাসেবক'! ক্যাপ্টেন রাসেলের ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য ভুবনের হাতে ছিল তিন মাস। এই তিন মাসে ক্রিকেট - আনাড়ি চম্পাণের একাদশকে তৈরি হয়ে মাঠে নামতে হবে। ইংরেজদের ঔপনিবেশিক রাজস্ব - ব্যবস্থার অমানবিক মুখ পোড়ানোর জন্য ইংরেজদেরই জাতীয় খেলা ক্রিকেটকেই প্রতিবাদের মঞ্চ হিসেবে বেছে নিয়েছিল ভুবন। আর তিন মাসের ওই 'কন্ডিশনিং ক্যাম্প' ছিল সেই আন্দোলনেরই প্রস্তুতিপর্ব। প্রায় জাতীয় সংহতির সরকারি বিজ্ঞাপনের ভিস্যুয়ালাইজারের মতো করেই ভুবন তার টিম সাজায়। তার মুসলিম বন্ধু -প্রতিবেশী ইসমাইল গোড়া থেকেই তার সঙ্গে থেকেছে এমন হয়তো নয়। কিন্তু ভুবনের মিশন ক্রিকেট' -এ সে সবে থেকে শামিল হয়েছে, তার অনুগত্যে কোনও খামতি থাকেনি। আসল ম্যাচেও সে ভয়ানক চোট নিয়েও ভুবনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুরন্ত লড়াই করে টিম ভুবনকে প্রায় জয়ের কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রও তো তার ভৌগোলিক সীমরেখার মধ্যে বসবাসকারী মুসলিম জনতার কাছ থেকে এইরকমই শৃঙ্খলাবদ্ধ, নিবেদিত-প্রাণ, প্রশ্নহীন পূর্ণ আনুগত্য দাবি করে। ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থায় মেজরিটিজমের যে সহজাত ঝোঁক আছে, সুপ্রিম কোর্টও যেটাকে একদা 'ভারতীয়ত্ব' বলে চালাতে চেয়েছিল, সেটা সম্পর্কে সামান্য আপত্তি তুললেই তাদের গায়ে 'বাবর কা অওলাদ' বা 'পাকিস্তানের দালাল' গোছের বিশেষণ দেগে দেওয়া হয়। 'চক দে ইন্ডিয়া'-র কবির খানকে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছিল। বাবরি মসজিদ ও কার্গিল - উত্তর ভারত সেখানে 'লগান'-এর ইসমাইলকে ক্লিনচিট দেয়।

সংহতির মিছিলেই টিম ভুবনে শামিল হয়ে যায় এক বহিরাগত শিখ অলরাউন্ডারও। চম্পাণের ভূমিপুত্র না হলেও, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক ওপেনিং বোলার, ওপেনিং ব্যাটসম্যান এই চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার টিমে আসায় ভুবন একাদশের শক্তি যেমন বাড়ে, তেমনই সংহতির বিজ্ঞাপনটাও আরও চওড়া আর পোক্ত হয়। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই শিখ সর্দারের মনে যে তীব্র জিঘাংসা ছিল, 'গান্ধিবাদী' ভুবন সেই সহিংস মিলিটান্ট জাতীয়তাবাদকে নিপুণ নেতৃত্বে অহিংস প্রতিবাদের লাইনে ঘুরিয়ে দিতে পেরেছিল। ফলে গান্ধিবাদী সংহতি আর রাজনীতি, দুয়ের ওটাকেই বড়ো করে নিতে কোনও অসুবিধে হয়নি। ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীনও আমরা দেখেছি যে ব্রিটিশদের উগ্র-মারমুখী মনোভাব, আগ্রাসী বডি-ল্যাঙ্গোয়েজ, এমনকী রীতিমতো হিংস্র শারীরিক আক্রমণও ভুবন একাদশের সদস্যরা গান্ধিপ্রাণিত অহিংস সত্যাগ্রহীদের মতোই ধৈর্য-সংকল্প-মানসিক দৃঢ়তা দিয়েই শরীরে পেতে নিচ্ছে। তারা প্রত্যাঘাত করছে না। বরং শাসকের অধৈর্য-অত্যাচারী আগাত তাদের লক্ষ্যপূরণের জেদ আর তাগিদ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এই গান্ধিবাদী গণ-সংহতির বৃত্তেই ভুবন আচমকা গ্রামের একমাত্র দলিত প্রতিনিধি 'কাচড়া'কে ডেকে নেয়। এমনিতে ২০০১ সালের 'লগান'-এর চম্পাণের গ্রামে আমরা যে নেশন-ভারত দেখি সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির রামজন্মভূমি কেন্দ্রিক 'কমণ্ডল' রাজনীতির মতোই ভি পি সিং-অনুপ্রাণিত, লালু-মুলায়ম যাদব প্রযুক্ত 'মণ্ডল' রাজনীতিরও কোনও আপাত অস্তিত্ব নেই। ব্রিটিশ শাসন আর দেশীয় রাজা ছাড়া চম্পাণের গ্রামের আর কারোর শ্রেণি, জাতি বা বর্ণগত পরিচয় পরিষ্কার নয়। আমাদের নেশন নির্মাণ প্রক্রিয়ায় এটাও এক রকমের গান্ধিবাদী কৌশলই। ট্র্যাডিশনাল ভারতীয় সমাজে বর্ণ ও সম্পদের ভিত্তিতে যে তীব্র বিভাজন আছে, গান্ধিজির গণ-আন্দোলনের 'জাতীয় সমাজ'-এ সেই ভাগাভাগিটাকে যতদূর সম্ভব 'অস্পষ্ট' রাখারই চেষ্টা করা হয়েছ। তবু যেহেতু শূদ্র-দলিত সমাজের প্রতি ভারতের বাদবাকি 'জাতীয়তাবাদী', 'দেশপ্রেমিক', 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী' এবং গান্ধিজির কর্মসূচির 'সক্রিয় কর্মী' বর্ণহিন্দু সমাজের বহু বছরের লালিত ঘৃণা, বিদ্বেষ আর বৈষম্যের মানসিকতাকে কিছুতেই চাপা দেওয়া যাচ্ছিল না, তাই গান্ধিজি কৌশলগত কারণেই দলিতদের 'হরিজন' বলে একটা বিশেষ 'আইডেনটিটি' দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাদেরকে হিন্দু সমাজ ও জাতীয় আন্দোলনের মেইনস্ট্রিমে শামিল করার পথ খোঁজেন। আর এই পথ খোঁজার প্রচেষ্টাতেই তিনি ভারত দলিত বনাম উচ্চবর্ণের দু'হাজার বছরের বিরোধ ও সংঘাতের ইতিহাসকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন।

আসলে গান্ধিজির রাজনীতির ধরণ অনুযায়ীই এটা ছিল আপোশ বা সমঝোতার একটা ট্র্যাটেজি। তিনি চাননি জাতীয় আন্দোলনের কোনও স্তরে, নেশন-নির্মাণের প্রক্রিয়ার কোথাও বিভাজন বা বিরোধিতার কোনও বয়ান থাকুক। তিনি চেয়েছিলেন দলিতরা তাদের আত্মপরিচয় ও রাষ্ট্র-নির্মাণের আন্দোলনে তাদের নিজস্ব স্পেসের জন্য জেদাজেদি, জোরাজুরি ছেড়ে দিক। অন্যদিকে উচ্চবর্গীয় বর্ণহিন্দুদেরও 'হৃদয়ের পরিহর্তন' হোক, তারা আরও মুক্ত, মহৎ উদার হোক— এবং নেশন -নির্মাণের মেইনস্ট্রিম রাজনীতিতে তারা দলিতদেরও দয়া করে একটু ঠাঁই করে দিক। স্বাভাবিকভাবেই দলিত আন্দোলনের প্রাণপুরুষ বি. আর. আম্বেদকর সেই দয়ার দান নিতে চাননি; তিনি সংঘাতের পথই বেছে নিয়েছিলেন। গন্ধি বনাম আম্বেদকরের বিরোধে সেই ইতিহাসে আমাদের ঢোকার দরকার নেই। আমরা শুধু এটাই বলতে চাই, গান্ধিজির নেশনের ধারণায় যেমন ভারত ইতিহাসের বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতার বিভিন্ন স্তরগুলোকে ধামাচাপা দেওয়া না হলেও এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়, চম্পাণের মিনি-ভারতেও

তেমনি বর্ণবিভক্ত সমাজের টেনশনগুলোকে অদৃশ্যই রাখা হয়। তাই দেশীয় রাজার ভক্ত-অনুগত প্রজা, রায়ত-ওয়ারি খাজনা দেওয়া, ব্রিটিশ শাসনের আজ্ঞা -অনুশাসন মান্যকারী সুশীল উপনিবেশবাদী, চম্পাণের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ, বর্ণহিন্দু না ওবিসি বা অনান্য অনগ্রসর জাতি, 'লগান' নির্মাতাদের কাছে সেই পরিচয়টা কখনো গুরুত্ব পায়নি। অথচ টিম ভুবনের বহিরাগত শিখটি বা ইসমাইল-সহ গ্রামের বাকি মুসলিমদের আইডেনটিটি, কিছু স্টিরিওটাইপ চিহ্ন বা লক্ষণযুক্ত হয়ে একদম সাফ।

আসলে সংহতির বিজ্ঞাপনে এটাই দস্তুর। সংখ্যালঘু শিখ-মুসলিমদের ধর্মীয় আইডেনটিটির 'চিহ্ন' পরিয়ে দেওয়া হয়। আর ওই বিজ্ঞাপনের হিন্দুটি, একটি সমসত্ত্ব কমিউনিটির সুবোধ প্রতিনিধি! সেই সমাজের ভেতরকার গুচ্ছের ভাগাভাগি-কাটাকাটি-জল অচল-ছায়া না মাড়ানোর দীর্ঘ ইতিহাসের কোনওই ছাপ ওই বিজ্ঞাপনের ছবিটায় পড়ে না। 'লগান'-এ 'তবু' যে ভুবন, দলিত 'কাচড়া'-কে ডেকে নেয়, কারণ গান্ধিজির 'সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং' -এর তত্ত্ব তাকে সেই পরামর্শই দেয়। এই কাচড়ার অন্যান্য দলিত ভাই-বেরাদররা কোথায় গেল—বর্ণপ্রথার চাপে প্রান্তিক হতে হতে, তারা একেবারে মিলিয়েই গেল কিনা, এসব প্রশ্ন তোলার কোনও অবকাশ 'লগান' আমাদের দেয় না। কারণ টিম ভুবনে কাচড়ার অন্তর্ভুক্তি এতটাই নাটকীয়, দলের বাকি সদস্যদের তরফে বাধাটা এতটাই উচ্চকিত যে, সেসব প্রশ্ন মনেই পড়ে না। ভুবন, কাচড়া (শব্দটির বাংলা করলে দাঁড়ায় 'আবর্জনা')-কে টিমে নিতে চেয়েছিল, কারণ ভুবন বুঝেছিল, কাচড়ার প্রায় পঙ্গু (সম্ভবত পোলিও-র) ডান হাত অসাধারণ বল স্পিন করাতে পারে (আর্ম-স্পিনার? ভাগবত চন্দ্রশেখরের মতো)। আর তার টিমের বাকি সদস্যরা (মুসলিম ও শিখ খেলোয়াড়দের বাদ দিয়ে), এমনকী সরপঞ্চ সহ গাঁয়ের বাকিরাও কাচড়াকে দলে নেওয়ার প্রবল বিরোধিতা করেছিল, কারণ অচ্ছুৎ-অস্পৃশ্য কাচনার ছোঁয়ায় ক্রিকেট-ব্যাট, বলসহ গোটা ক্রিকেট ম্যাচটাই অশুচি, অশুদ্ধ হয়ে যাবে। সবাই ধর্মভ্রষ্ট হবে! 'গান্ধিবাদী' ভুবন এইরকম একটা পরিস্থিতিতে গ্রামবাসীদের এতকালের রক্ষণশীল ধ্যানধারণার গোড়ায় আঘাত করে। সে রামায়ণের উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করে দেয়, শূদ্রকে সমাজের মুলধারায় ঠাঁই দেওয়া, কাচড়াকে দলে নেওয়া, মোটেই ধর্ম-বিরোধী নয়— বরং এটাই ধর্ম। কারণ স্বয়ং 'ভগবান রাম' -ই তো দলিত শবরীর উচ্ছিষ্ট ফল খেয়েছিলেন!

রামচন্দ্র যেমন দলিত শবরীর এঁটো ফল খেয়ে জাতপাতের সংস্কার হেলায় উড়িয়েছিলেন, তেমনিই বেদপাঠের 'অপরাধ'-এ আরেক দলিত শম্বুককে হত্যাও করেছিলেন! অবশ্যই সেই দলিত-হন্তারক রাম হলেন বিজেপি-র মিলিটান্ট-সন্ত্রাসী 'রাম'। গান্ধিজির, তুলসীদাসের শান্ত-সমাহিত 'মর্যাদা পুরুষোত্তম' রামের 'অপর'। এই 'রাম' এল. কে. আদবানির সঙ্গে দাঙ্গা-রথযাত্রা করেন। এই 'রাম' করসেবকদের বাবরি-মসজিদ ধ্বংসের প্ররোচনা দেন। এই রামের ভক্তরাই 'লগান' -এর সঙ্গে একই দিনে মুক্তি পাওয়া চড়া হিন্দুত্ববাদী 'গদর' -কে সুপারহিট করে দেয়। গান্ধিজির 'রাম', ভুবনের 'রাম' নরম-সরম, আপোশপন্থী। এই রাম বর্ণহিন্দুদের ধৈর্যশীল হওয়ার 'শিক্ষা' দেন, দলিতদের 'নেশন' নির্মাণের প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে নিজেদের 'ভালো হিন্দু' প্রমাণ করার প্রেরণা দেন চম্পাণের লোকেরাও তাই নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। তারা কাচড়াকে দলে ঠাঁই দেয়। দলিতের 'দক্ষতা' নয়, তারা 'অক্ষমতা', 'সম্পূর্ণতা' 'অপারগতা'-র শক্তিকেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কাজে লাগায় ভুবন। সেই নিজে যখন ছক্কা মেরে ম্যাচ জেতাচ্ছে, তখনও অপরপ্রান্তে 'নন-স্ট্রাইকার' ব্যাটসম্যান কাচড়া। ভারতের রাষ্ট্র-নির্মাণ প্রক্রিয়াতেও তো দলিতরা ওই নন-স্ট্রাইকারের ভূমিকায়—কোটা সংরক্ষণ প্রথার কৃপা-করুণা প্রার্থী। তার 'অপারগতা'-ই তার ভোটব্যাঙ্ক, তার শক্তি।

চক দে ইন্ডিয়া : 'কড়া কেন্দ্র আর 'ভালো' মুসলিম

'চক দে ইন্ডিয়া' ছবিটা শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ হকি ফাইনালে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের দৃশ্য দিয়ে (অবশ্যই ভুবন একাদশ বনাম ক্যাপ্টেন রাসেলের ফৌজি টিমের ম্যাচটার মতোই এই খেলাটাও পৃথিবীতে কোনোদিন হয়নি!)। ভারতের ক্যাপ্টেন তথা তারকা-স্ট্রাইকার কবির খান খেলার একেবারে শেষ মুহূর্তে একটা পেনাল্টি স্ট্রোক নষ্ট করে। ভারত শেষ অবধি ম্যাচটা হেরে যায়। মিডিয়ার প্রচার কবির খানকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। রটিয়ে দেওয়া হয় কবির ইচ্ছে করেই পেনাল্টিটা মিস করেছে। যেহেতু ম্যাচটা পাকিস্তানের সঙ্গে আর কবির খান জন্মসূত্রে মুসলিম - ফলে অপপ্রচারের গায়ে সহজেই সাম্প্রদায়িক রং লেগে যায়। বলা হয়, কবির পাকিস্তানকে ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছে। মোড়ে মোড়ে তখন কবিরের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো চলছে। তার গলায় ঝোলানো বোর্ডে লেখা 'গদ্দার'— বিশ্বাসঘাতক। চ্যানেলে-চ্যানেলে বাইট —সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ে জেন-ওয়াই, ঠোঁট উলটে, কাঁধ শ্যাগ করে জানিয়ে দিচ্ছে—ওইজন্যেই মুসলিমদের কখনোই পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। ওরা এদেশে থাকবে-খাবে কিন্তু দালালি করবে পাকিস্তানের। যে-কোনও বিস্ফোরণের পর কাগজে চ্যানেলে সন্ত্রাসবাদীদের নাম দেখুন। যে-কোনও কেসের অপরাধীদের নামের লিস্ট দেখুন— দেখবেন সবই মুসলিম।

দেশসুদ্ধু এই বিদ্বেষের আবহাওয়ায় কবির খানের বাড়িতে যে পাবলিকের হামলা ভাঙচুর হয় সেই পাবলিকের ভিড়ে যে কয়েক পিস বজরঙ্গি বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদ্যসরাও গা মিশিয়ে ঢুকে পড়বে সেসব বলা-ই বাহুল্য। তবে বিক্ষোভকারীদের আশা পুরোটা পূর্ণ হয়নি। কবির খানকে সামনে পেলে ঝালটা যেভাবে মেটানো যেত,

সেটা যায়নি। কারণ কবির তার বৃদ্ধা মাকে নিয়ে কোথায় একটা অজ্ঞাতবাসে চলে গেছে। কারণ সে বুঝে গিয়েছিল, এই দেশে, এই মুহূর্তে তার কোনও বন্ধু নেই। কেউ তার কথা বিশ্বাস করবে না। কাউকে সে তার কথা বিশ্বাস করাতেও পারবে না। সেই বিশ্বাস করাতে পারবে না, ক্রিকেটে 'ম্যাচ ফিক্সিং' হোক বা না হোক, একজন হকি খেলোয়াড় কিছুতেই তার খেলার সঙ্গে বেইমানি করতে পারে না। (এই ছবির পরের দিকে তথাকথিত 'গেম অফ ক্রিকেট' সম্পর্কে আরও কিছু বাঁকা, তেতো, তির্যক, তির্যক মন্তব্য আছে—এমনকী ক্রিকেটারদের নপুংসক হিজড়ে বা 'ছক্কা' অবধি বলে দেওয়া হয়েছে!) এমনকী তার নিজের কওম-এর লোকেরাও বলাবলি করে—এইরকম দু-একজন 'খারাপ' মানুষদের জন্যই গোটা ভারতের মুসলিম সমাজের বদনাম হয়। সব মিলিয়ে বিচ্ছিন্নতা-বন্ধুত্বহীনতার একেবারে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায় কবিরের। এইরকম একটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আধুনিক ভারতবর্ষের একজন মুসলিম সংখ্যালঘু আত্মহত্যা করতে পারে— কোনও মৌলবাদী মুসলিম সংগঠনে ভিড়ে গিয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে।

কিন্তু কবির খান এসব কিচ্ছু করে না। পরিচালক শিমিত আমিনের ন্যারেটিভে কবির আবার কাহিনিতে উদয় হয় সাত বছর পরে বিশ্বকাপগামী ভারতীয় মহিলা হকি দলের কোচ হিসেবে। তার কোচিংয়েই অস্ট্রেলিয়ার মহিলা হকির বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত মুখোমুখি হয় অস্ট্রেলিয়ার। 'চক দে ইন্ডিয়া' ছবি শুরু হয়েছিল একটি পেনাল্টি স্ট্রোকের দৃশ্য দিয়ে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই স্ট্রোকটা মিস্ করেছিল কবির। ছবির ক্লাইম্যাক্সেত আমরা আবার একটা পেনাল্টি স্ট্রোকেরই দৃশ্য দেখি। এটা ট্রাইব্রেকারের ফাইনাল শট। ভারতীয় মহিলা দলের গোলরক্ষক পেনাল্টিটা আটকে দিলেই বিশ্বকাপ ভারতের। 'টু বি আর নট টু বি'-র দোলাচলে গোটা মাঠ এবং অবশ্যই কবির খান। সেই 'লগান' -এর ক্রিকেট ম্যাচে নো-বলের সৌজন্যে ভুবনদের একটা অতিরিক্ত 'ডেলিভারি' পেয়ে যাওয়ার মুহূর্তের মতো টেনশন। ওখানে ভুবনের ব্যাটে বলে না হলেই তিন গুণ খাজনা। এখানে গোল বাঁচাতে না পারলে কবির খান আবার আগেকার বিস্মৃতির অন্ধকারে! কিন্তু রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে কবিরের সঠিক টিপ্‌সের দৌলতে দলের গোলরক্ষক-ক্যাপ্টেন পেনাল্টি-স্ট্রোকটা বাঁচিয়ে দে। ভারত মহিলা হকির বিশ্বকাপ জিতে যায়। কবির খানের শাপমুক্তি ঘটে।

ম্যাচের শেষ বলের সময় মাঠের মধ্যে, ব্যাটিং-ক্রিজে থাকা ভুবন ও টাইব্রেকারের শেষ পেনাল্টি স্ট্রোক নেওয়ায় সময় ড্রাগ আউটে থাকা কবির খানের মধ্যে পরিস্থিতির আপাত মিল থাকলেও, গুণগত ফারাক কিন্তু অনেকটাই। ভুবন যখন প্রথম ক্যাপ্টেন রাসেলের ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ নিয়েছিল, তখন চম্পাণের গ্রামের আর কেউ তার সঙ্গে ছিল না। কিন্তু পরে তিন মাসে ভুবন ওই ক্রিকেট ম্যাচটাকে একটা নৈতিক আন্দোলনের জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। ফলে ম্যাচটার যেটা আসল উদ্দেশ্য মানে খাজনা মকুব, সেটাকে ছাড়িয়ে খেলাটা ব্রিটিশ কর্তৃত্বের সঙ্গে একটা মতাদর্শগত মহড়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ফলে ম্যাচটা হেরে গেলে তিন গুণ খাজনা দিতে হবে, এই ব্যাপারটার চেয়েও ম্যাচটা খেলতে হবে এবং কিছুতেই পিছিয়ে আসা যাবে না এটাই জরুরি হয়ে ওঠে। ভুবন চম্পাণেরবাসীর কাছ থেকে তার সিদ্ধান্তের পক্ষে সেই বৈধতা আদায় করে নিতে পেরেছিলেন। গান্ধিজিও একইভাবেই ১৯২১-এর 'অসহযোগ' বা ১৯৩০-এর 'আইন-অমান্য' আন্দোলনের জন্য দেশের মানুষের বৈধ সমর্থন পেয়েছিলেন। সেখানেও আন্দোলনের জন্য চূড়ান্ত রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণের চেয়েও তার নৈতিকতা বা বৈধতাই ছিল শেষ কথা। আন্দোলন সেই বৈধতা হারিয়েছে মনে করেছিলেন বলেই তিনি আচমকাই অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। আর সেইজন্য কিছু খুচরো সমালোচনার তির ছোঁড়াছুড়ি হলেও গান্ধিজির জনসমর্থনের ভিত্তি কোথাও টাল খায়নি। তাই আট বছর পরে আইন অমান্যের ডাকেও লোকে আবার গান্ধিজিকে বিশ্বাস করেই পথে নেমেছিল।

এত কথা বলার একটা কারণ-ভুবন বর্ণহিন্দু -দলিত-মুসলিম-শিখ সহ ভারতীয় জাতীয়তার সমস্ত উপাদানগুলো সঙ্গে নিয়ে এগারো জনের দল বানিয়ে মাঠে নামাতেই তার লড়াইয়ের প্রথম কিস্তিটা জেতা হয়ে গিয়েছিল। তাই 'লগান' ম্যাচটা হেরে গেলেও হয়তো চম্পানেরবাসী তার পাশ থেকে সরে যেত না। কিন্তু কবির খানের সামনে ট্রফি জেতা ছাড়া কোনও বিকল্প ছিল না। এখান থেকেই শিমিত আমিন স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, 'সেকুলার' ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একজন মুসমিল ভারতীয়র অবস্থান ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন। স্রেফ 'কবির খান' নামটির জন্যেই তার দেশপ্রেম, তার সততা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠে যায়। মিডিয়া, সমাজ, আমাদের সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি তার বিরুদ্ধে 'উইচ হান্টিং'-এ নেমে পড়ে। 'চক দে ইন্ডিয়া'-য় এই অবধি কোনও সমস্যা ছিল না। আমরাও আমাদের অভিজ্ঞতায় জানি, আমার একটা তথাকথিত হিন্দু পদবির ল্যাজসহ তৎসম আর্য নামের দৌলতে আমি অনায়াসে পাকিস্তানি ক্রিকেট দলকে গলা ফাটিয়ে সমর্থন করতে পারি—প্রকাশ্যে নির্দ্বিধায় ইমরান খান বা শোয়েব আখতারদের ফ্যান হতে পারি। কিন্তু আমার সমবয়সের, সম পেশার, সম রাজনৈতিক -সাংস্কৃতিক চেতনাসম্পন্ন একজন আমরা মতো একই কারণে পাকিস্তান দল বা ইমরান খানকে পছন্দ করলেও তার জন্মসূত্রে পাওয়া আরবি নাম ও ধর্মীয় পরিচয়ের খাতিরে সে কথাটা মুখ ফুটে বলতে ইতস্তত করবে।

তার সেই অভিশপ্ত বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচের পরে কবির খান নেশন-ভারতের এই সামাজিক-রাজনৈতিক

'মেজরিটিজম' -রই শিকার হয়েছিলেন। এই সংখ্যাগুরুবাদ কখনও অশোক সিংহল, কখনও প্রবীন তোগাড়িয়া, কখনও -বা বাল ঠাকরের সুভাষিত সুবচনে মাঝেমধ্যে প্রকাশ্যে এলেও, আমাদের রাষ্ট্র-চেতনার তলেতলে, মনে মনে, আভাস-ইঙ্গিতে, এই ব্যাপারটা বারবারই আছে। আসলে আমাদের রাষ্ট্রীয় সংহতির বিজ্ঞাপনে, আমাদের সেকুলার সংস্কৃতির ভাব-মন্দির এসবই বলি—ভুল করেও 'মসজিদ' বলি না), আমাদের জনপ্রিয় সংস্কৃতির টেক্সটে 'ভালো মুসলিম' -এর একটা সংজ্ঞা আছে। সেই সংজ্ঞা-মাফিক 'ভালো মুসলিম' হবে লগানের ইসমাইলের মতো নম্র, বিনীত, বাধ্য, বশ্য, আজ্ঞাবহ, প্রশ্নহীন আনুগত্যের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। আর আর এই সংজ্ঞার খোপে যারা আঁটবে না, তারা, বলিউডে সিনেমার বা টেলিভিশনের পর্দার 'শনশনানি' ('সেনসেশনাল' বলে ঠিক মানেটা বোঝা যায় না) অন্তর্তদন্তমূলক ভার্চুয়াল রিয়েলিটির দুনিয়ায় হয় আই.এস. আ-এর এজেন্ট নয় তো সিমি-র সদস্য, কিংবা ছবির বাজেট বেশি হলে এল. ও. সি. পেরিয়ে সীমান্তে ওপার থেকে ট্রেনিংত নিয়ে এসে কট্টর লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি হয়ে যায়! এই দুয়ে মাঝামাঝি, দেশপ্রেমিক কিন্তু ভারতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, তার নেশন-নির্মাণের চরিত্র সম্পর্কে সপ্রশ্ন মুসলিম চরিত্রদের আমাদের গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতা খুব একটা নিতে পারে না। 'চক দে ইন্ডিয়া'য় কবির খানকে তাই প্রাণপণে 'ভালো মুসলিম' হওয়ার প্র্যাকটিশ করতে হয়। কেউ যাতে চেষ্টা করেও তার জাতীয়তাবাদে কোনও খুঁত ধরতে না পারে, কবির তাই ভারতীয় গণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বা তথাকথিত নেহরুবাদী 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'র ধারণাটাকেই চ্যালেঞ্জ করে ফেলেন। বা করতে বাধ্য হন! কীভাবে আমরা সেটা এবার দেখব।

আগেই বলেছি ছবি ন্যারেটিভে একেবারে গোড়ায় সেই পেনাল্টি-স্ট্রোক ট্র্যাজেডির পর কবির আবার সা বছর পর ফিরে আসবে ভারতীয় মহিলা হকি দলের কোচ হয়ে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে জাতীয় দলের জন্য নির্বাচিত মেয়েদের একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে দিল্লিতে উইমেন্স হকি অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব মাঠে এসে নাম নথিভুক্ত করতে হয়। যদিও বছরের বেশিরভাগ সময়েই ওই মাঠটা রামলীলা, যাত্রা, তামাশা ইত্যাদি হরেক কাজে ভাড়া দেওয়া হয়, তবু ওখানে অ্যাসোসিয়েশনের একটা আস্ত অফিস আছে, সেই অফিসে একজন কর্মচারীও আছেন, যিনি এই খেলোয়াড়দের নাম রেজিস্ট্রি করার কাজটা করেছিলেন। (ঘটনাচক্রে এই একই অভিনেতা 'লগান'-এ ব্রিটিশ শাসকদের ইংরেজি-জানা নেটিভ মুন্শির ভুমিকায় অভিনয় করেছিলেন, ম্যাচ চলাকালীন যে শিবির পালটে পুরোপুরি ভুবনদের পক্ষে চলে আসে)। তো ছবিতে এই ভদ্রলোক একেবারে টিপিক্যাল, আধা-শিক্ষিত, হিন্দু, উত্তরভারতীয় 'কমন্-ম্যান', যিনি ভারতবর্ষের ঐক্য-বৈচিত্র্য-সংহতি-যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ইত্যাদি সবকিছুকেই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন। তাই উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে আসা দুই মিজো ও খাসি তরুণীকে তিনি বললেন — ভারতে আপনাদের স্বাগত। এখন উত্তর-পূর্ব ভারতের চিরকালীন কেন্দ্র-বিরোধিতা, দীর্ঘদিনের 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আন্দোলনের প্রেক্ষিতেই হয়তো ভদ্রলোক ওভাবে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু ওই দুটি মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাদের 'জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া' জানিয়ে ফেলে। তারা বলেন— নিজেদের দেশেই আমাদের অতিথির মতো স্বাগত জানাচ্ছেন! একইভাবে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আসা তেলেগুভাষী মেয়েটিকেও 'ম্যাড্রাসি' বলে তিনি নতুন করে তর্ক জড়ান। মেয়েটি বোঝাতে চায়, দক্ষিণ ভারতের সব মানুষই 'মাদ্রাসী' নয়—কেউ তামিল, কেউ তেলেগু, কেউ কন্নড়, কেউ মালয়ালি। কিন্তু এই ভদ্রলোক, তার আশৈশব-লালিত উত্তরভারতীয় স্টিরিওটাইপ ভারত-দর্শন মাফিক, দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতির অতসব বৈচিত্র্য বুঝতেই চান না। তার আকাট উত্তর—ওসব তামিল-তেলেগু বুঝি না, আমাদের কাছে সবাই 'ম্যাড্রাসি'!

এই ডিসকোর্স থেকে দর্শকের মনে হতেই পারে, পরিচালক হয়তো আমাদের জাতীয় সংহতির অতিরিক্ত 'কেন্দ্রাতিগতা', 'মূল ভূখণ্ড' বা উত্তর-ভারতীয় মানসিকতার 'ওভারটোন'-কে আক্রমণ করতে চাইছেন। কিন্তু তখনই ন্যারেটিভে ঢুকে পড়ছে জাতীয়তাবাদী 'ভালো মুসলিম' কবির খান, সেই কবির খান যাকে তার গা থেকে পূর্বাশ্রমের 'দেশদ্রোহী' তকমা মুছে ফেলতেই হবে। জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র নির্মাণে তার ভূমিকাও যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কারোর চাইতে কম নয় সেটা তাকে প্রমাণ করতেই হবে! এই বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা মেয়ে খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময়েই কবির সেটা প্রমাণ করে ছাড়ল! ব্যাপারটা এরকম হয়েছিল যে প্রত্যেক রাজ্য থেকে আসা এক একজন খেলোয়াড় নিজের নাম আর রাজ্যের নাম বলছে, আর অমনি কবির খান খুবই রুক্ষ স্বাদে 'আউট' বলে তাকে লাইন থেকে বার করে দিচ্ছে। এমনি করে হরিয়ানা, রাজস্থান, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, মিজোরাম, মেঘালয় ঝাড়খণ্ড সব্বাই বাদ পড়ে যাচ্ছে; শেষে রেলওয়েজ থেকে আসা গোলরক্ষক মেয়েটি (যে ক্লাইম্যাক্সে টাইব্রেকার বাঁচিয়ে দেশ ও কবির খানের মুখ রেখেছিল!) বলল— 'ইন্ডিয়া'ঃ ভারত! কবিরের মুখ জাতীয়তাবাদী গর্ব ও তৃপ্তির হাসি ফুটল। হয়তো নিশ্চিন্তিরও। যাক গোটা টিমে কেউ তো অন্তত আছে, যে নিজেকে খণ্ডিত-প্রাদেশিক পরিচয়ে নয়, জাতীয় পরিচয়ে চিহ্নিত হতে চায়। গৌরবের সঙ্গে বলতে পারে— 'হম হিন্দুস্তানি' ('গরব সে বোলো হম হিন্দু হ্যায়' শ্লোগানটাও খুবই কাছাকাছি নয়?)। কোচিং ক্যাম্পে আসা বাকি সদস্যরাও এবার কোচের মরজিটা বুঝতে পারল। আবার নাম ডাকা শুরু হতেই সবাই নিজের নামের সঙ্গে এক নিশ্বাসে 'ইন্ডিয়া' শব্দটা উচ্চারণ করেই গর্বিত মুখে লাইনে দাঁড়িয়ে যায়! মরালটা খুবই স্পষ্ট—যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো-টাঠামো বুঝি না— তুমি যদি তোমার প্রাদেশিক আত্মপরিচয় নিয়ে গর্বিত থাকে তো তুমি বাদ! আর যদি

সেই খণ্ডিত আইডেনটিটি জীর্ণ বস্ত্রে র মতো ছেড়ে এসে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরের নিজেকে বিলীন করে দিতে পারো তো, তোমাকে আমরা 'জাতীয়' কর্মসূচিতে ডেকে নেব।

এখন কেউ কেউ বলতে পারেন, ব্যাপারটাকে এতটা আক্ষরিক অর্থে নেওয়াটা টিক হবে না! 'চক দে ইন্ডিয়া' তো আসলে একটি স্পোর্টস মুভি আর কবির খান এখানে একজন পেশাদার কোচ। ডিসিপ্লিনের ম-বাবা হীন। একটা ছন্নছাড়া-উচ্ছৃঙ্খল দলকে একসূত্রে বাঁধার জন্যেই তাকে ওই জাতীয়তাবাদের কড়া দাওয়াই দিতে হয়েছে। অথচ প্যাকটিশের সময় ঝাড়খণ্ড থেকে আসা আদিবাসী মেয়েটি যখন হিন্দি না জানার জন্য বদমেজাজি পাঞ্জাবি ডিফেন্ডারটির কাছে হেনস্থা হচ্ছিল, এই কবির খানই তখন ত্রাতার মতো নেশন -নির্মাণ প্রক্রিয়ার প্রান্তে থাকা মেয়েটির পাশে দাঁড়ায়। পাঞ্জাবি মেয়েটি পালটা ধমক দিয়ে বলে—জাতীয় দলে খেলতে গেলে হিন্দি শিখে আসতে হবে এমন কোনও শর্ত নেই। ও হকিটা শিখেছে ওটাই যথেষ্ট। তার মানে, প্রাদেশিক আঞ্চলিক ভাগাভাগি কূটকটালির উলটোদিকে 'শক্তিশালী কেন্দ্র'-র জন্য গলা ফাটালেও কবির কিন্তু সংঘ-পরিবারের নিদানমতো জাতীয় নেশন-নির্মাণে হিন্দু-হিন্দু-হিন্দুস্তানের ত্রিভুজ সূত্রে ভরসা করে না। জাতীয়তাবাদের বহুস্বরেই তার বিশ্বাস—শুধু কেন্দ্রটাকে একটু শক্তপোক্ত, দৃঢ়চেতা হতে হবে। আমি ঝাড়খণ্ডি বা আমি হরিয়ানাভি বলে চোখ রাঙিয়ে যাওয়া চলবে না। অবশ্য কবির খানের টিম অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপে যত বেশি বেশি সাফল্য পেতে থাকে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওই মঙ্গোলীয় ছাঁদের মেয়েগুলি, অন্ধ্রের ওই তেলেগু-তরুণী বা ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী অরণ্যকন্যাদের তত বেশি বেশি করে মাঠের বাইরে, রিজার্ভ বেঞ্চেই বসতে দেখা যায়। প্রান্তিক হতে হতে সেমি-ফাইনাল, ফাইনালে ওরা টিম থেকে হারিয়ে যায়। সেই মুম্বাই, চণ্ডীগড়, দিল্লি, পাঞ্জাবরাই কাপ জেতায়। রাষ্ট্র-ভারতের মেধা-মান-ক্ষমতার কেন্দ্র তো ওখানেই। কবির খান, সংখ্যালঘু হিসেবে জাতীয়তার ক্ষমতাকেন্দ্রে যার নিজের গ্রহণযোগ্যতা বা 'ক্রেডেনশিয়াল'-ই বেশ নড়বড়ে, তাকে তাই জাতীয়তাবাদী চেয়েও বেশি চড়া-কড়া জাতীয়তাবাদী হয়ে নিজের অবস্থান টিক রাখলে হয় ভারত রাষ্ট্রে মুসলিম সংখ্যালঘুর এটাই ট্র্যাজেডি।

পান সিং তোমার : রাষ্ট্রের এপিঠ-ওপিঠ

'চক দে ইন্ডিয়া'-র কবির খান চরিত্রটি নাকি ১৯৮২ এশিয়াডে পাকিস্তানের কাছে ৭-১ গোলে চূর্ণ হওয়া অভিশপ্ত ভারতীয় হকি দলের হতভাগ্য গোলরক্ষক মীররঞ্জন নেগির জীবনের ছায়ায় তৈরি। অবশ্যই সিনেমার কবির খানের মতো বাস্তবের নেগির খড়-পুতুল পোড়ানো হয়েছিল বলে শোনা যায়নি। তবু কবির খানের খেলোয়াড় জীবনের লজ্জা ও পরে কোচ হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে নেগির জীবনের কিছু কিছু বাস্তব হয়তো মিলেও যেতে পারে। কিন্তু পান সিং তোমার নামের মানুষটি ১৯৩২ থেকে ১৯৮১ সাল অবধি সত্যি এই ভারতবর্ষের বুকে বেঁচেছিলেন। ১৯৪৭-এ যখন সত্যি সত্যি স্বাধীন 'নেশন' ভারতের জন্ম হচ্ছে, তখন পান সিং-এর বয়স ১৫। টিগমাংশু ঢুলিয়ার শুরুতে গোয়ালিয়রের এক স্থানীয় ফ্রি-লান্স সাংবাদিকের সঙ্গে এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার তিনি যখন তার স্মৃতি ঝাঁপি উপুড় করেছেন, সেখানেও শোনা যাচ্ছে, স্বাধীন, সার্বভৌম এক নতুন রাষ্ট্রের জন্মবৃত্তান্ত —ইংরেজ দেশ ছেড়ে পালাল, পণ্ডিতজি প্রধানমন্ত্রী হলেন, 'অওর নব্‌ভারত কি নির্মাণ শুরু।' আর সেই নেশন-নির্মাণের সলতে পাকানোর পর্বে মধ্যপ্রদেশের মোরেনা জেলার ভিদৌসা গ্রামের পান সিং তোমারেরও কিছু 'যোগসূত্র' ছিল। পান সিং যার গাঁয়ে বেশ মোটামুটি পেট চালানোর মতো জমিজমা বসতবাড়ি আছে, বন্দুক-রাইফেলের সঙ্গে আশৈশব সখ্য আছে– পান সিং তোমার, যার মামা বিখ্যাত বাগি, পুলিশ যাকে কোনোদিন ছুঁতেই পারেনি, সেই কৃষিজীবী পরিবারের নেহাতই সরল, গ্রাম্য, দেহাতি যুবকটি সটান ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিল। কিন্তু পারিবারিক ও আঞ্চলিক সূত্রে তার বায়োডটায় কাঁটার মতো উঁচিয়ে রইল তার 'বাগি' বা দস্যু-যোগাযোগের ইতিবৃত্ত।

এখন প্রশ্ন হল পান সিং তোমার কেন সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন? চাষবাসের অনিশ্চিত সংসার, নিয়মিত মাস-মাইনের আর একটু সচ্ছলতা আনতে? নাকি পণ্ডিত নেহরুর নতুন ভারত-নির্মাণের ডাকে সাড়া দিতে? সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে হালকা গোছের শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে পান সিংকে যখন বড়োকর্তাদের ঘরে হাজির করা হয়, তখনও এরকম একটা প্রশ্ন উঠেছিল। সেনাকর্তা চম্বলের বাগি-দস্যুর ভাগ্নে পান সিং-এর রাষ্ট্রীয় আনুগত্য যাচাই করতেই প্রশ্ন করেছিলেন—সরকারের সম্পর্কে তার কি ধারণা? পান সিং সরাসরি উত্তর দেন— 'সরকার তো চোর হ্যায়!' একেবারে দ্বিধা-সংকোচহীন, সামনের লোকটা কী ভাববে সে ব্যাপারে একটুও সাবধানতাহীন, বেপরোয়া নির্ভীক সারল্যময় এখনও গ্রাম-ভারতের ৯৫ শতাংশ মানুষে এই প্রশ্নটাই করলে একই রকম প্যাঁচ-পয়জারহীন উত্তরটাই পাওয়া যাবে। কিন্তু নবভারত নির্মাণের একেবারে প্রথম যুগে, চম্বল-বেহড়ের এক ফেরার দস্যু-সর্দারের ঘনিষ্ঠ তরুণ আত্মীয়ের মুখে এই উত্তরটায় সেনাকর্তা অনিবার্য 'সিডিশন' বা দেশদ্রোহিতার গন্ধ পেয়েছিলেন। পরিবারে রাষ্ট্রদোহিতার 'বনেদি' উত্তরাধিকার আছে, সরকারের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, রাষ্ট্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই— এতো পাক্কা 'মিউটিনি-মেটিরিয়াল'-সেনা-ছাউনিতে যে-কোনও দিন বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয় দেবে! পান সিং সম্পর্কে অন্যান্য সেনা-অফিসারদের কাছে এইরকমই মন্তব্য করেছিলেন ওই সেনাকর্তা। অথচ সেনাবাহিনীর অনুশাসন কাঁপিয়ে দেওয়া, এই সরল বিস্ফোরক ডায়লগবাজির অবকাশেই কিন্তু পান সিং তাঁর সেনাবাহিনীর

ভর্তি হওয়ার কারণটাও ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন—এই দেশে 'আর্মি ছোড়কর সবই চোর হ্যায়'—আর সে জন্যেই সরকারি চাকরি না করে, তিনি সেনাবাহিনীর চাকরিতে যোগ দিয়েছেন! এখন ভারতীয় সেনার কমিশন্ড অভিসাররা এই বিবৃতি বা স্বীকারোক্তির নিষ্পাপ সারল্যের মধ্যে যতই রাষ্ট্র-বিরোধিতার ঝোঁক খুঁজুন, ছবির পান সিং তোমার কিন্তু তার বিবেকের কাছে একদম পরিষ্কার ছিলেন। আর এখন থেকেই বোধ হয় পান সিং তোমারের সঙ্গে ভারত-রাষ্ট্রের সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতার প্রয়াস শুরুয়াত!

যে পান সিং তোমার মনে করেন, ভারত সরকার আপাদমস্তক দুর্নীতিবাজ, রাষ্ট্র-কাঠামোয় প্রচুর গলদ, সেই পান সিং-ই আবার সেই একই দেশের, একই সরকারের সেনাবাহিনীকে ক্লিন-চিট দিচ্ছেন কীভাবে? আসলে বোফর্স-হাউইটজার কামান, মিগ বিমান কেনাবেচার কাহিনির নানান ধাপে কাটমানির হরির লুট, অস্ত্র কেনার জন্য স্বয়ং সেনাপ্রধানকে ঘুস কিংবা কার্গিল যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের জন্য কফিন কেনা নিয়ে কেলেঙ্কারি কালির ছিটে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সর্বস্তরে তখনও তো সেভাবে লাগেনি! তখনও দেশের সাধারণ মানুষ যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রে 'পবিত্র গাভী' মনে করে সেনাবাহিনী তার মধ্যে এক নম্বর। পান সিং তোমার, চম্বলবাসী বীর - পূজারি পান সিং তাই 'সরকার' সম্পর্কে একটা সংশয়-অনাস্থা আর সেনাবাহিনী সম্পর্কে একটা অন্ধ আনুগত্য নিয়ে 'আর্মি'-তে যোগ দেয়। এবং আশ্চর্যজনকভাবে পান সিং তোমার যখন ডাকু বাগি, তখনও ভারত রাষ্ট্রের এই অন্যতম প্রতিষ্ঠা সেনাবাহিনীর 'মহান', 'পবিত্র সততা' সম্পর্কে তার আস্থা টলে যায়নি। এক বেআইনি অস্ত্র-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তার ডাকাত দলের জন্য বন্দুক কেনবার সময় বন্দুকের গায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাপ দেখে পান সিং প্রথমে অবাক হয়ে যান। চোরাই অস্ত্রের খুচরো ডিলারটির এ ব্যাপারে কোনও জ্ঞানগম্যি না থাকায় তিনি নিজেই সিদ্ধান্তে পৌঁছোন—এটা নিশ্চয়ই পুলিশের অস্ত্রাগার থেকে পাচার হয়েছে। 'আর্মি' কখনও চুরি করতে পারে না! মানে তখনও সেই 'চোর' সরকার। দুর্নীতির পাঁকে ডোবা অসামরিক প্রশাসন আর 'পবিত্র' সেনাবাহিনীর মধ্যে ভাগাভাগি!

কিন্তু পান সিং তোমারের এই নিজস্ব ভুবনে ভ্রষ্ট 'সরকার' আর মহান 'আর্মি'-র মাঝামাঝি কোথাও 'দেশ' বা 'জাতীয় রাষ্ট্র' বা 'ভারতীয়ত্ব'-র কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল কি? থাকলেও কীভাবে ছিল? কবির খানের প্রমীলা টিম ইন্ডিয়ার যে মেয়েটি নিজের নাম বলার সময় কোনও 'প্রাদেশিক' আত্মপরিচয়ের ছাপ জোড়েনি, সেই মেয়েটি কিন্তু রেলওয়েজের তরফে জাতীয় দলের নির্বাচিত হয়েছিল! তিন হাজার মিটার স্টিপ্‌ল চেজ রানার, জাতীয় রেকর্ডধারী চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলিট পান সিং তোমারও চিরকাল সার্ভিসেসর হয়েই জাতীয় গেমসে অংশ নিয়েছেন, এশিয়ান গেমসে জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাহলে তার চেতনায় প্রাদেশিক আঞ্চলিক-স্থানীয়, যাবতীয় আইডেনটিটির শিকড় উপড়ে 'হম হিন্দুস্তানি' বলে 'জাতীয়' গর্ব প্রকাশ করার মুহূর্ত কখনও আসেনি? ছবিতে যেটা পান সিং তোমারের জীবনের শেষ দৌড় সেই আন্তর্জাতিক ডিফেন্স মিটে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ফিনিশিং রোপের দড়ি ছিঁড়ে তিনি যখন ক্লান্ত শরীরে ট্র্যাকের ওপর গড়িয়ে পড়েন, তখন ক্যামেরার ক্লোজ আপে শচীন তেন্ডুলকরের হেলমেটের লোগোর মতোই তার ঘামে-ভেজা শরীরে লেপটে থাকা জামাতেও একবার জ্বলজ্বল করে ওঠে রাষ্ট্রীয় ভারতের তেরঙা প্রতীক! কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তার সেই তিন রং তার প্রখর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি-চেতনাকে রাঙিয়ে দিতে পেরেছিল কি কখনও?

আসলে 'চক দে ইন্ডিয়া'-র কবির খান যেভাবে তার টিম ইন্ডিয়ার মেয়েদের খণ্ডিত স্থানীয় পরিচয়গুলোকে রাষ্ট্র-ভারতের বেদিমূলে উৎসর্গ করে তাদেরকে 'জাতীয় মানবী' করে তুলতে চেয়েছিলেন, পান সিং তোমারের দৌড়টাই তার উলটো রাস্তায়। জাতীয় - রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক থেকে তিনি বারবার ফিরতে চেয়েছেন তার গ্রামে, তার বেহড়, তার চম্বলের স্বাধীনতায়। তিনি সুবেদার পান সিং তোমার, সার্ভিসের হয়ে সাতবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান, এশিয়ান গেমসে একটুর জন্য সোনা ফসকানো জাতীয় অ্যাথলিট, এই পরিচয়ের মান-মর্যাদার পাশাপাশি তিনি পান সিং তোমার—গাঁও ভিদৌসা, জেলা—মোরেনা, এই পরিচয়টাও তার কাছে কিছু কম গুরুত্বের ছিল না। তিনি যেখানে জন্মেছেন খেলাধুলো আনন্দ ফুর্তিতে বড়ো হয়েছেন। সংসার করেছেন, সেখানকার ক্ষেত-খামার, নদী-টিলা পাহাড়-জঙ্গল এই সবটাই তো তাকে গড়েছে। তার আত্মমর্যাদাবোধ, তার স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে আরও তীব্র করেছে। কিন্তু রষ্ট্র, তার নেশন-নির্মাণের প্রক্রিয়া, এই 'স্বাতন্ত্র্য' -কে সম্মান না করে, তাকে বরাবর মূলধারার অংশ করতে চেয়েছে। আর সেখানেই সংঘাতটা বেধেছে। চম্বলের মানুষ কেন 'বাগি' বিদ্রোহী হয়ে যায়, নবীন ভারত রাষ্ট্র তার পুলিশ-প্রশাসন সেটা কখনোই বুঝতে চায় নি— তাকে শুধু যেভাবেই হোক মূলধারায় ফেরাতে চেয়েছে। তার জন্য আত্মসমর্পণের প্যাকেজের বন্দোবস্ত করেছে। রাজকাপুরের 'জিস দেশ মে গঙ্গা বহ্‌তি হ্যায়' ছবিতে আমরা রাষ্ট্রের এই প্রকল্প দেখেছি। এমনকী চম্বলের তথাকথিত দস্যুরা কেন গড়পড়তা 'ডাকু' নয়, 'বাগি', পান সিং তোমার সেটা তার সাধের 'আর্মি'-র ওপরওয়ালাদেরও বোঝাতে পারেনি। কিন্তু আর্মি ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে যোগ দেওয়ার পর জীবনের প্রথম প্রতিযোগিতামূলক দৌড়ের শুরুতে তিনি যখন দম ধরে রাখতেই একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন, আর তার কোচ মা-বোন তুলে গালাগালি করছিলেন, রেস শেষ করে সেই স্নেহময় পিতৃতুল্য কোচকেও পান সিং সতর্কবাণী শুনিয়ে দিতে ছাড়েননি—মা-বাবা তুলে গালি দেবেন না স্যার...'হামারি মা বহোত্ পেয়ারি হোতি হ্যায়'...আমার দেশে 'গালি কি জবাব মে গোলি চল্ যাতি

হ্যায়...'!

পান সিং তোমাদের এই যে 'আমাদের দেশ', এটা কখনোই রাষ্ট্র - ভারত নয়। 'লগান'-এ ভুবনের নির্মিত গান্ধিবাদী ডিজাইনার্স থেকেও এটা একদম আলাদা। প্রত্যেক ভারতবাসীর 'ইন্ডিয়া'-র তথাকথিত ডিসকোর্স থেকেও এটা একদাম আলাদা। প্রত্যেক ভারতবাসীর মধ্যেই এইরকম একটা টুকরো একচিলতে, একান্ত 'আমার দেশ' থাকে। সেটাকে ঘিরে তার অনেক সাধ, আহ্লাদ, আশা, স্বপ্ন, স্বাধীনতা থাকে। নিজের বড়ো 'দেশ'-টার সহ-নাগরিক হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র তার দম্ভ কিংবা উদাসীনতায় মানুষের সেই ব্যক্তিগত পরিসরটুকু কেড়ে নিতে চাইলে, তাকে তাচ্ছিল্য করলে বা তার পবিত্রতা নষ্ট করলে কিন্তু সংঘাত বাধে। সেটা রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির, কিংবা রাষ্ট্রের সঙ্গে কৌমের বা রাষ্ট্রের সঙ্গে অঞ্চলের —যেমন খুশিই হতে পারে। এখানে যেমন রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাত বেধেছিল পান সিং তোমারের। রিটায়ার্ড সুবেদার পান সিং তোমার যখন সৎ নাগরিকের মতো রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কাছে, পুলিশ-প্রশাসনের কাছে তার রাষ্ট্রীয় পদ-মর্যাদার পরিচয় দিয়ে, তার পরিবার, তার সন্তান, তার জমি-জিরেত-সম্পত্তির ওপর ঘটতে থাকা অন্যায়ের প্রতিকার চাইতে গিয়েছিলেন, তখন প্রশাসন তার কথা শোনেনি। স্থানীয় পুলিশ অফিসার যখন তার 'জাতীয়' চ্যাম্পিয়নের মেডেলটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, 'আর্মি-ম্যান' অন্দরের বেহড়ের 'বাগি' হাতে বেআইনি বন্দুক তুলে নেয়। আমরা মনোজকুমারের 'উপকার' ছবিতে দেখেছিলাম জমি -সম্পত্তি নিয়ে শরিকি গোলমালের পর নায়ক 'ভারত' সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েই তার অভিমান-অসন্তোষ মেটাচ্ছে। অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে সে রাষ্ট্রের কাছেই নিজেকে সমর্পণ করেছে। রাষ্ট্রই হয়ে উঠছে তার ব্যক্তিজীবনের নিয়ামক। কৃষিভারত আর রাষ্ট্রীয়-ভারতের এই মিলনেই ছবিতে শ্লোগান ওঠে—'জয় জওয়ান জয় কিসান', যেটা ১৯৬৫-র ভারত-পাক যুদ্ধের সময়কার সরকারি বিজ্ঞাপনের ক্যাপশন ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের কাছে প্রত্যাঘাতে পান সিং ফিরছে তার আঞ্চলিক পারিবারিক 'বাগি' ঐতিহ্যে।

এটা ব্যক্তি পান সিং তোমাদের সঙ্গে ঠিক রাষ্ট্রে লড়াইও নয়। এটা আসলে প্রবল রাষ্ট্রের মস্ত কাঠামোয় ব্যক্তিগত একটা প্রতিবাদের দাগ রেখে যাওয়া। রাষ্ট্রে বা সেনাবাহিনী পান সিং তোমারের জন্য অ্যাথলেটিক্সের যে ইভেন্টা বেছে দিয়েছিল, সেই তিন হাজার মিটার স্টিপ্‌ল চেজ-ও তো ব্যক্তিমানুষের সহন-ক্ষমতা, ধৈর্য, জেদ আর ইচ্ছাশক্তির একটা পরীক্ষা। সেখানে আঠাশঠা হার্ডলস আর সাতটা জলের বাধা পেরিয়ে ফিনিশিং লাইনে পৌঁছোতে হয়। রেকর্ডভঙ্গকারী চ্যাম্পিয়ান অ্যাথলিট সে দৌড়ে খুবই নিঃসঙ্গ। তার ধারে কাছে আগে পিছে কেউ থাকে না। তাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পান সিং যখন অস্ত্র ধরেছেন, তখনও কিন্তু তিনি আর একটা রেস-ই দৌড়োচ্ছেন। তিনটে রাজ্য, দুটো নদী আর অসংখ্য চাষের খাল-নালা পেরিয়ে পেরিয়ে চলেছে তার এই রক্ত-বারুদ-বন্দুকের স্টিপ্‌ল চেজ। এবং রেসের নিয়ম তিনি জানেন। দৌড় একবার শুরু করলে, মেডেল জুটুক, ফিনিশিং লাইনে পৌঁছোতেই হয়। নইলে অ্যাথলিটের সম্মান থাকে না! তবে পান সিং তোমার তার বাগি জীবনেও মনে মনে পাক্কা অ্যাথলিট থেকে গেলেও, রাষ্ট্র কিন্তু ততক্ষণ ভূমিকা বদলে ফেলেচে। যে রাষ্ট্র ক্রীড়াদি পান সিং-এর নিরাপত্তার কথা ভেবে তাকে যুদ্ধে পাঠায়নি, সেই রাষ্ট্রই তার মাথার দাম ঘোষণা করে। ছবির একদম ক্লাইম্যাক্সে পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারের অন্তিম বুলেটটা যখন তার শরীরে বিঁধছে সাত বারের 'জাতীয়' চ্যাম্পিয়ন স্টিপ্‌ল চেজ রানার শেষ নালাটাও টপকে গেছেন। তিনি জীবনের ফিনিশিং লাইন ছুঁছেছেন। রাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। তার বিদ্রোহী সম্মান-মর্যাদা বজায় রেখেছেন। রাষ্ট্র কি তার সামনে টুপি খুলল? ছবিতে কিন্তু আমরা দেখিনি।